মোহাম্মদ তোহা খান

বাঘের সন্ধানে সুন্দরবনে



বাঘের সন্ধানে সুন্দরবনে

বাঘের সন্ধানে সুন্দরবনে

মোহাম্মদ তোহা খান

মুক্তধারা

মুক্তধারা ১৪৭০

প্রকাশক
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা ১১০০
প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৩৯৬
প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ রেজাউন নবী
মুদ্রাকর
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা ১১০০
মূল্য ১৬·০০ টাকা

BAGHER SANDHANE SUNDARBANE
[A Book on Tiger Hunting]
By Mohammad Toha Khan
First Edition : February 1990
Cover Design : Rezaun Nabi
Publisher C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj Dhaka 1100
Bangladesh
Price : Taka 16·00

যাঁর অনুপ্রেরণায় বইটি লিখতে পেরেছি—
আমার সহধর্মিণী হামিদা খানকে
মোহাম্মদ তোহা খান

উপক্রমনিকা

এদেশে যা হওয়ার নয় তাই হঠাৎ করে হয়ে যায়। আর যা হওয়ার দরকার মাথা কুটে মরলেও তা হয় না। বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী সম্পদ ও পাখি সম্পর্কে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র তাই দীর্ঘকাল তৈরি হতে পারেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকে আমি বহু কর্তার কাছে কাকুতি মিনতি করেও ফল পাইনি। স্বাধীনতার পরে কাজী আজহার আলী সাহেব তথ্য সচিব হলেও তিনি বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি। কেবল চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের কর্মকর্তাকে বলেছিলেন, সামনের বছরে সুন্দরবনের উপর একটা তথ্য চিত্র তৈরি করার জন্য যেন কিছু করা হয়। কর্মকর্তা ওহাব সাহেব কথাটা মনে রেখেছিলেন বলেই বোধহয় স্বল্প দৈর্ঘ্য ছায়াছবি নির্মিত হতে পেরেছে।

বাংলাদেশ বন বিভাগের দ্বিতীয় সম্মেলনের সময় তৎকালীন বন্য প্রাণী সংরক্ষক নূর মোহাম্মদ সরকার সাহেব আমাকে বললেন যে, সরকার তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য পনেরো লাখ টাকা বরাদ্দ করেছেন। তিন বছরের টাকা হাতে এসেছে। সুতরাং কাজ শুরু করা যেতে পারে। আমি বললাম, আর দেরি নয়, আরম্ভ করুন। তিনি কাহিনী লেখার দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে দিলেন। লেখার কাজ আরম্ভ করে বিপদে পড়লাম। একবার অঞ্চলভিত্তিক আবার একবার পশু-পাখিভিত্তিক লেখা—কেউ এটা পছন্দ করেন আর কেউ তা বাতিল করেন। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত লেখা ও চিত্র তৈরি করার কাজ একসঙ্গে চলতে লাগলো। কিন্তু হাতে যা টাকা তাতে আধ ঘণ্টা ছবির অর্ধেকও করা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত সরকারি চলচ্চিত্র বিভাগে যেতে হলো। সেখানেও খরচ কম নয়। অতঃপর ওহাব সাহেবই উদ্ধার করলেন বিপদ থেকে। তিনি বিভাগের খরচ কেটে বাদ দিয়ে কেবল জিনিসপত্রের জন্য চার্জটাই ধার্য করলেন। যন্ত্রপাতি, লোক-লস্করেরও ব্যবস্থা করে দিলেন। ফলে কাজ আরম্ভ হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ছবির শেষ দেখে যেতে পারেননি। হঠাৎ অসুখে পড়ে বিদেশে যেয়ে মানবলীলা সংবরণ করেন। সুতরাং প্রামাণ্য এই তথ্য চিত্রটি তাঁর বিশেষ অবদান হিসাবেই চিহ্নিত হবে।

ছবি শেষ হয় হেমায়েতউদ্দীন সাহেবের আমলে। তবে ছবি তোলার কাজ যা করার তা করেছেন বিভাগীয় ক্যামেরাম্যান বাবু, আরশাদ ও আর একজন যার নাম আমি ভুলে গেছি। অবশ্য মুল কাজ করেছেন বন বিভাগের লোকজনেরা। লেখা ছাড়াও আমাকে বন বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বনে যাওয়ার কাজ করতে হয়েছিল। সুন্দরবনে আমি বহুবার গিয়েছি। সুতরাং সেখানকার অনেক জায়গা আমার বিশেষ পরিচিত। ছবি ওঠাতে দু দু বার আমি বনে গিয়ে মাস দেড়েক কাটিয়েছি। এভাবে বহু কষ্টে ছবি তৈরি হয়। কিন্তু যেভাবে কাটা-কাটি করা হয়েছে তাতে ছবি অনেক ক্ষুণ্ন হয়েছে।

এ বইয়ে যা লেখা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক। ঢাকা চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ছবি নির্মাণে অমূল্য সাহায্য করেছেন। তাঁরাও সেজন্য ধন্যবাদের পাত্র।

মোহাম্মদ তোহা খান

২.২.৯০

কুশল বিনিময়ের পর চা পানের পালা সাঙ্গ করেই আমরা সে দিনের মত বিদায় নিতে চাইছিলাম। সারাদিনের পথকষ্টে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম সকলেই। বিশ্রাম ব্যতিরেকে এ শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর করা সম্ভব নয় বুঝে হাবীব সাহেব সে ব্যবস্থাই করেছিলেন।

একেবারে রাজসিক ব্যবস্থাই। খুলনায় আমাদের স্থায়ী শিবির হলো "বনরানী"তে। সেখানে না চাইতেই জলই শুধু মেলে না, মেলে আর্দালী চাপরাসী থেকে সকল পরিচর্যাকারীর। "বনকন্যা" ও "বনরানী" আপন গর্বে গরবিনী সেই ইংরেজ আমল থেকে। তাদের আঙ্গিনায় অতিথিপরায়ণতার ত্রুটি হওয়ার জো নেই। সাজসজ্জা ও যাত্রা বিরতিতে উৎকণ্ঠা বোধ করছিলাম। যন্ত্রযানের মাথা আবার বিগড়ালো নাতো। উৎসুক হয়ে তাকাতে চালকের কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম। যন্ত্রযানের গোলমাল নয়। কারণ ভিন্ন সহযাত্রীদের কারো কারো প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার তাগিদ ছিল। তৃষ্ণা নিবারণের প্রয়োজনও কেউ কেউ অনুভব করছিলেন।

কথায় বলে, "বসলাম তো জিরিয়ে নি।" আমাদের দশাও অনেকটা তেমনি। ফালগুনের শেষে দুপুরের পরে একটানা প্রায় ৮০/৯০ মাইল দৌড়ের শ্রান্তি-ক্লান্তি অল্প বিস্তর সবারই ছিল। সুতরাং বিরতি দীর্ঘতর হলো। ব্যক্তিগত কর্ম যে যার মতো সেরে ফিরে এলেও চা-পানের অজুহাতে আরো মিনিট বিশেক কেটে গেলো।

লোক লস্কর নিয়ে এদের বন বিহারের খরচ ঘণ্টায় হাজার পাঁচেক টাকার মতো। না চললেও দৈনিক খরচ হাজার খানেকের কাছাকাছি। "বনরানীর" সুকোমল শয্যা ও সুখাদ্যে আমরা আরামেই সারা রাত কাটিয়ে ছিলাম।

সকালে হাবীব সাহেবের সাথে আমরা আলোচনায় বসলাম। হামীদ সাহেব, বাবু ও আমি। হামীদ সাহেব রসদ পত্রের খবর বুঝে নেবেন। আমাদের জন্যে কোথায় কি ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে হাবীব সাহেব বুঝিয়ে দেবেন হামীদ সাহেবকে। বাবু ও আমাকে বুঝে নিতে হবে বনের পশু-পাখিদের হাল-অবস্থা, বাঘ থেকে বানর পর্যন্ত স্তন্যপায়ী পশু, কুমীর থেকে গো-সাপ পর্যন্ত সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী, মাছ, হাঙ্গর এবং ঈগল থেকে মাছরাঙ্গা পর্যন্ত যত পাখি সুন্দরবনে আছে সেগুলো ছাড়াও মৌমাছিদের পর্যন্ত আমাদের ক্যামেরায় ধরতে হবে। এদের মধ্যে বাঘ ও কুমীরের সাক্ষাৎ পাওয়াই দুরূহ ব্যাপার। সুন্দরবনের সবখানে বাঘের চলাচল থাকলেও তার দেখা খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটেছে। বনের মধ্যে বাঘের সান্নিধ্য আমি বহুবার উপলব্ধি করেছি। আমি চাক্ষুষ দেখতে পেয়েছি মাত্র তিনবার। একবার দেখেছি বিশাল মালঞ্চ নদী সাঁতরাতে প্রায় বিশ বছর আগে, তখন আমাদের সাথে ক্যামেরা ছিল না। আর দেখেছি দু'বার পলকের মধ্যে লাফ দিয়ে চলে যেতে। ক্যামেরা হাতে থাকলেও সেবার ছবি নেওয়া সম্ভব হয়নি।

রাতে বনের মধ্যে ছবি তোলা সম্ভব নয় নানা কারণে। সব ছবিই দিনের বেলা নিতে হবে। বিরাটকায় মুভিক্যামেরা নিয়ে দুর্গম অরণ্যে ছুটাছুটি করে ছবি নেয়া সম্ভব নয়। পর্যাপ্ত আলো চাই ছবি তুলতে। আর চাই সুন্দরবনের ভেতর চলার অভিজ্ঞতা। বাবু ইতিপূর্বে এই বন দেখে গেলেও ভেতরে ঢোকেনি। আরশাদের তো এই প্রথম আগমন। আমি বনের ভেতরে চলতে কিছু অভ্যস্ত হলেও মুভিক্যামেরার 'ম' পর্যন্ত বুঝি না। সুতরাং, আমাদের ছবি তুলতে হবে, এমন জায়গা থেকে, যেখানে সূর্যের আলো আছে। বাঘের চলাচলের পথে গাছের উপর মাচা বেঁধে বা বাঘের ডেরায়

আস্তানা গেড়েই এ ছবি নিতে হবে। নদীর ওপরে চলমান লঞ্চ থেকেও কখনো কখনো বাঘকে কিনারে পানি খেতে কিংবা নদী পার হতে দেখা যায়। কিন্তু সেটা ভাগ্যের কথা। সুতরাং, ডি এফ ও সাহেবের কাছ থেকে আমাদের খবর নিতে হবে কোথায় বাঘের আনাগোনা বেশি, কোনখানে বেশি মানুষ পেটে যাচ্ছে এবং কোন এলাকায় শাবকদের নিয়ে বাঘিনীর ঘোরাঘুরি দেখা গেছে।

সমস্যা কুমীরের ছবি নেয়ার্তেও। শীতের দিনে ভাটার সময় কোন কোন নদীর পারে রোদ পোহাতে থাকা কুমীর দেখা যায় ঠিকই। কিন্তু সর্বশেষ, তাদের আনাগোনা কোথায় বেশি দেখা গেছে সে খবরও নিতে হবে ডি এফ ও সাহেবের কাছ থেকে। 'সুন্দরবনের ভেতরে একটানা বেশি দিন থাকা আর রণক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশে দিন কাটানো একই কথা। এই অরণ্যে সৈনিকের জীবন-যাপন করতে হয়। প্রথম পর্যায়ে আমরা তিন সপ্তাহের প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল এক যাত্রায় সুন্দরবনে ক্যামেরার কাজ শেষ করা, সে জন্যে প্রয়োজন ছিল অবিরাম চলাচলের উপযোগী জলযানের। কিন্তু সেখানেই বিধিবাম।

সকালে ডি এফ ও সাহেবই দুঃসংবাদটা দিলেন। আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট জলযানটির চালক নেই। কি কারণে যেন প্রাক্তন চালক দীর্ঘকাল কর্মস্থানে অনুপস্থিত, হাবীব সাহেব জাদরেল অফিসার, আমাদের সামনেই হুকুম দিলেন নতুন সারেং নিয়োগ করার। রসদ পত্র কেনাকাটা করার জন্যে একজন অফিসার এবং প্রয়োজনীয় ধারণা নিয়ে আমরা ফিরে এলাম 'বনরানী'র কাছে।

দিনটা যখন খুলনাতে কাটাতে হবে, তখন বন্ধুজনের সাথে আনন্দে কাটানোই ভাল। পত্রিকা এজেন্ট 'রঞ্জনা'য় হাজির হলাম। বড় কাব্যময় নাম বেছে নিয়েছেন তসলিম সাহেব তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্যে। কচিমিয়া বা কচিভাই বললে খুলনা

শহরের যে কেউ চিনিয়ে দেবে 'রঞ্জনা'র মলিককে। শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সরকারি আমলা থেকে রিকশাওয়ালা পর্যন্ত সকলেরই আপনজন তিনি। দিল খোলা চমৎকার মানুষটি। হাসিমুখে স্বাগত জানান যতক্ষণ কার্যালয়ে বসেন। বহুমুখী কারবার, তাঁর প্রতিষ্ঠানের নিচের তলায় বিপণী বিতান. উপরে বাসস্থান, একেবারে নগরীর প্রাণকেন্দ্রের সাইন বোর্ডে ভিন্ন বানান লেখা থাকলেও সবাই বলে অঞ্জনা। আমি তাই বলি। এই নামটা আমাকে সব সময় কবি গুরুর 'একগাঁয়ে' কবিতাটার কথা মনে করিয়ে দেয়। কচিমিয়া কি ভেবে তাঁর প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেছিলেন জানি না, জিজ্ঞাসাও করিনি, 'তাহার নামটি রঞ্জনা কি-না'।

তসলিম সাহেব কার্যালয়ে ছিলেন না। কারবারের তত্ত্বাবধানকারী তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কয়েকজন ছিলেন। আমার পরিচিত সবাই। কুশল বিনিময় সংক্ষেপে সেরে বন্ধুজনের সন্ধানে দূরালাপনীর শরণ নিলাম। কিন্তু কপাল মন্দ। নিকট বন্ধুদের সঙ্গ পাওয়ার উপায় নেই। বাংলাদেশ বার্তা সংস্থার আশরাফুদ্দিন মকবুল স্বগ্রামে। আর বাংলাদেশে অবজার্ভার-এর সাবেক হেডকোয়ার্টার ঢাকায়। টেলিফোন ছেড়ে রাস্তায় বের হতে দেখা মিললো পুরানো বন্ধু শাহাবুদ্দিনের। শাহাবুদ্দীন সংবাদপত্র জগতে প্রায় দু'দশক কাটিয়েছেন ঢাকার বিভিন্ন ইংরেজি পত্রিকার প্রতিনিধিরূপে। তিনি আমাদের সংগই শুধু দিলেন না, আপ্যায়নও করলেন। আমাদেরকে টেনে নিয়ে গেলেন খুলনা ক্লাবে। নগরীর অভিজাত শ্রেণীর সান্ধ্যকালীন সেরা প্রমোদকেন্দ্র খুলনা ক্লাব। ফুর্তি আনন্দের কোন উপকরণের অভাব এখানে রাখা হয়নি, রাখতে দেননি, প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে এই প্রমোদকেন্দ্র যাঁরা গড়েছিলেন সেই শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানরা। শ্বেতকায় ইংরেজ সাহেবরা এ দেশীয়দের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে তখন বঙ্গদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছেন। প্রশাসন, পুলিশ, এমনকি বিচার

বিভাগেরও সর্বেসর্বা হয়ে এসেছিলেন জনকয়েক ইংরেজ রাজ পুরুষ তৎকালীন জেলা প্রশাসন কেন্দ্র খুলনা শহরে। সুইট হোম ইংল্যাণ্ড আর মডারেট ক্যালকাটার আনন্দময় নিরাপত্তার মধ্যে তারা পুত্র পরিবারকে রেখে তাঁদেরকে আসতে হয়েছে লবণাক্ত জলাজঙ্গল এলাকার এই প্রায় নতুন জনপদে। 'অসভ্য' নেটিভদের শাসন দণ্ডে 'সভ্য' ও বশীভূত রাখার সাথে সাথে আপনজনদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের মহান দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত। এই দুরূহ কর্মের ক্লান্তি দুর করার জন্যে চাই দিবাবসানে অবসর বিনোদনের সর্বব্যবস্থা সম্পন্ন মিলন-কেন্দ্র। এমনি প্রয়োজনে রাজ পুরুষদের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলোতে গড়া হয়েছিল বিশেষ প্রমোদকেন্দ্র তথা ক্লাব। খুলনা ক্লাব-এর পত্তনে এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ঘটেনি। সাহেবদের সাথে মেমসাহেব না থাকলে অবসর জমে না। চরম পুলকে সাদা কালোর ভেদাভেদ রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং দেশী সিভিলিয়ান ও উচ্চবর্ণের সামন্তদেরও সমাগম ঘটেছিল শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের মনোরঞ্জনের প্রয়োজনে। এ ভাবে 'খুলনা ক্লাব' অভিজাতদের আড্ডাখানায় রূপান্তরিত হয়েছে, যেমন হয়েছে 'ঢাকা ক্লাব' 'নারায়ণগঞ্জ ক্লাব' ও ইত্যকার প্রমোদ-কেন্দ্রগুলো।

ইংরেজ শাসনের অবসানে পাকিস্তান আমলে এ আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ উচ্চ পদস্থ সরকারি ব্যক্তিবর্গ এবং ধনাঢ্য ব্যবসায়ীরা, স্বাধীন বাংলাদেশেও সে ঐতিহ্য নষ্ট হতে দেননি। এহেন আনন্দ কেন্দ্রের সুন্দর পরিবেশে আমাদের আপ্যায়নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয়নি। শাহাবুদ্দিন সাহেব দাঁতের যন্ত্রণায় অস্থির থাকাতে তিনি নিজে কিছু মুখে তোলেননি। কিন্তু আমাদের তৃপ্ত করেছিলেন সর্বোতভাবেই।

দশটার আগেই আমরা বিদায় নিয়ে 'বনরানী'র কাছেই ফিরে এলাম। আহারের প্রয়োজন 'খুলনা ক্লাবে' চুকিয়ে এসেছি। বয়ে

এনেছি আনন্দের রেশ। সেই রেশ অটুট রেখেছিল 'বনরানী' নিভৃতে নিশি-যাপনের সুচারু ব্যবস্থা করে। কেবিনে একা আমি। সাথে পড়ার বই অনেক ছিল। তারই একটা নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়ছিলাম নদীর বাইরের দিকের একটা জানালার কাঠের জানালা তুলে দিয়ে, তারের জাল দিয়েও সুরক্ষিত জানালা। সে জাল তোলা যায়, না তুললেও চলে। ওটা আমি তুলিনি নদীর খোলা হাওয়া পাওয়ার আশায়, জানালা দিয়ে ফিরে ফিরে হাওয়া আসছিল ঠিকই। তবে সে হাওয়ায় মেশানো ছিল কোলাহল। নানাজনের কণ্ঠস্বর, চলমান যান্ত্রিক জলযানের আওয়াজ ও যন্ত্রবিহীন নৌযানগুলোর ছলাৎ ছলাৎ শব্দের সে এক অদ্ভুত কোরাস। এমন কোরাসে আর যাই করা যাক বইয়ের পাতায় মন সংযোগ করা চলে না। সুতরাং বাতি নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কানে ভেসে আসছিল ঐ কোরাসের গান, যার শব্দগুলো বিচ্ছিন্নভাবে শোনার উপায় নেই দূর থেকে। কাছ হতে সেভাবে শুনতে গেলেও বেসুরো শুনাবে সেই ঐকতান।

ফাড়া পরের দিনও কাটলো না। সারেং অবশ্য পাওয়া গেলো। অভিজ্ঞতা বেশি না হলেও খুবই সাহসী করম আলী সাহেব। বাড়ি তার ঢাকার মুন্সীগঞ্জে। কয়েক বছর শিক্ষানবিশী করার পর চালকের লাইসেন্স পেয়ে সে খুলনায় রয়ে গেছে। সরকারি-বেসরকারি লঞ্চে বদলী কাজ করে মোটামুটি সংসার চালানোর মতো রোজগার সে করছিল। বন বিভাগের ঠেকায় বার দুই তিন ছোট লঞ্চ নিয়ে সুন্দরবনের নদী-নালা চিনেও এসেছে করম আলী। ডি, এফ, ও গোলাম হাবীব তাকে ডাকিয়ে এনে আমাদের সামনেই "বনপক্ষী" লঞ্চে সারেং পদে বহাল করার হুকুম দিলেন। আশায় বুক ভরে নিয়ে 'বনরাণী'র আলয়ে আমরা ফিরে এলাম।

কিন্তু, না বিপত্তির শেষ নেই। একটা কাটে তো আরেকটা

হাজির হয়। চালক এসে দেখলো বাহক "বনপক্ষী" সাংঘাতিক ভাবে বিগড়ে বসে আছে। মবিল ট্যাংকে ফুটো, ব্যাটারীও চলার যোগ্য নয়। ঝালাই মেরামত ও ব্যাটারী চার্জ দিতে কম করেও দিন তিনেক সময় দরকার। আমি কাজ-কর্মের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে ঢাকায় ফেরার কথা ভাবছিলাম। ফিরলে বাংলাদেশের বনজঙ্গলের পশু পাখী সংক্রান্ত প্রথম প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ অংকুরেই বিনষ্ট হবে—এই চিন্তা করে, পানি কতদূর গড়ায় দেখতে খুলনায় রাতে রয়ে গেলাম। দ্বিতীয় চিন্তার সুফল মিলেছিল পরের দিন। 'বনপক্ষী" চলার উপযোগী হয়ে না উঠলেও বিভিন্ন রেঞ্জের লঞ্চ ফরেস্টর অফিসের ঘাটেই ছিল। মাসের প্রথম দিকে ও মাঝখানে রেঞ্জ কর্মকর্তারা রাজস্ব জমা দিতে আসেন খুলনার সদর দপ্তরে। ফেরেন কর্মচারিদের বেতন-ভাতার টাকা ও বাজার সওদার মালপত্তর নিয়ে। বহু জনের এক পক্ষ কালের খোরাকি ও অন্যান্য দরকারি জিনিস পরিমাণে কম নয়। তারো চেয়ে হাজার হাজার টাকা নেয়া-দেয়ার জন্য বয়ে বেড়ানো। সুতরাং পাহারাদারসহ রেঞ্জের লঞ্চ আসা যাওয়া করে। সেই লঞ্চ একটা আমি ধরে বসলাম।

ভাটির দেশের মানুষের বিশ্বাস বনবিবির টান মায়ার টান। সে টানে তাঁর রাজ্যে বারবার যেতে হয়, তার রাজ্য বাদাবন বা সুন্দরবন। সেখানে গেলে মায়ার টান টানে। এ বিশ্বাস ঠিক কি বেঠিক জানি না। কে জানে এই মায়ার টানে বাওয়ালীরা বাঘের, সাপের ছোবল খেয়েও সুন্দরবনে পড়ে থাকতে চায় কিনা। আমার মনে হয়, এ বিশ্বাসের কথাটা সত্য হয়ে বসেছে। হয়তো সেই অদৃশ্য মায়া আমাকে প্রতিবছর টেনে নিয়ে যায় সুন্দরবনে। এবারেও নিশ্চয়ই তেমন কোন টান ছিল। তা না হলে সুন্দরবনের এ প্রান্ত হতে ও প্রান্তঅবধি এক সাথে দেখবার এমন একটা উপলক্ষ সৃষ্টি হলো কিভাবে।

উপলক্ষ তৈরি হয়েছিল সুন্দরবনের বন্য প্রাণী সম্পর্কে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র তৈরি করার উদ্যোগের ফলেই। উদ্যোগটা সৃষ্টি করতে হয়েছিল। এমনিতেই তা আসেনি। গত পঁচিশ বছর ধরে বাংলাদেশের অরণ্য জীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য ছায়াছবি তৈরি করার অনুরোধ নিয়ে আমি দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়েছি। সে সব অনুরোধ অরণ্যে রোদনেই পর্যবসিত হয়েছিল ইতিপূর্বে। তাই ফেব্রুয়ারি মাসে বন্য প্রাণী বিষয়ক বন সংরক্ষক প্রীতিভাজন নূর মোহাম্মদ সরকার যখন জানালেন যে, বাংলাদেশের বন্য প্রাণী সম্পর্কে সরকার দ্বিতীয়-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রামাণ্য ছায়াছবি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন নিজের হাতে চিমটি কেটে অনুভবের চেষ্টা করলাম আমি জীবিত না মৃত। এ দেশে প্রকৃত কল্যাণকর কোন কাজে কখনো যে হাত দেয়া হবে এমন আশা আমি জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম। অতীতের অভিজ্ঞতাই আমাকে হতাশাবাদী করেছিল।

আশাবাদী হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। পাকিস্তান আমল থেকে সুন্দরবনের অরণ্যজীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র তৈরি করতে এসেছে মার্কিনীরা, জাপানি, জার্মান এমনকি ইংরেজরাও। তৎকালীন সরকার ভিন দেশীয়দের সার্বক্ষণিক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন চলচ্চিত্রের ছবি তুলতে। সে ছায়াছবি তাদেরকে অঢেল মুনাফা অর্জনের পথও করে দিয়েছে। এদেশের সরকার তাদের কাছ থেকে ছায়াছবির একটি কপি নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন। আপন দেশের অমূল্য অরণ্যজীবন সম্পর্কে ছবি তৈরি করতে নিজেরা কখনো উদ্যোগী হননি, সরকারী উপদেষ্টা বোর্ডের বৈঠকে এ সম্পর্কে একাধিকবার আমার প্রস্তাব গৃহীত হয়েও কার্যকর হতে পারেনি। অর্থাভাবের অজুহাতে সর্বদাই ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখা হয়েছে কাজের দিকটা। তাই বছরে তিন লাখ টাকা করে

পাঁচ বছরে পনেরো লাখ টাকা বরাদ্দের খবর আমাকে চমকে দিয়েছিল। তারপর সরকারের তরফ থেকে একদিন খবর পেলাম সুন্দরবন নিয়ে প্রকল্পের সূচনা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারি কর্তৃপক্ষের এহেন সুমতি হবে ভাবিনি। দু'বছর আগে যা বিবেচনার বাইরে ছিল তাই-ই বাস্তবায়িত হতে চলেছে, এটা কার ভাগ্যের জোরে কে জানে।

পিছুটানে সব কিছু কেঁচে গণ্ডুষ হওয়ার দৃষ্টান্ত এদেশে কম নেই। তার উপর লালফিতার দৈর্ঘ্য দিনে দিনে অনেক বেড়েছে। এই দৌরাত্ম্য কমাতে না পারলে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র কেন সময়াভাবে স্থির আলোকচিত্রের এ্যালবাম তৈরি করাও সম্ভব হবে না। আধ ঘণ্টার রঙীন ছায়াছবি বরাদ্দ সর্বসাকুল্যে তিন লাখ টাকা। এই টাকায় এমন দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি হতে পারে কিনা তা আমার জানার কথা নয়। ছায়াছবির আঙ্গিনায় উঁকি দেয়ার দুঃসাহস দেখতে যাওয়ার কথা কখনো আমার স্বপ্নেও মনে আসেনি। অতএব, তার খবর আমার ধারণার বাইরে।

সুন্দরবনের অরণ্যচারী প্রাণীর উপর ছায়াছবি নির্মাণের দায়িত্ব বন বিভাগের তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানো শোভনীয় নয়। বুঝেও আমি নিরস্ত থাকতে পারিনি। সাংবাদিক জীবনের দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে গয়ংগচ্ছ ধারায় সরকারী কাজ আমি বহু দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতাই আমাকে টোকা দিয়ে বলেছিল চারমাসের মধ্যে দুর্গম সুন্দরবনে গিয়ে ছবি তুলে শেষ করতে হলে একটু ধাক্কা দেয়ার দরকার আছে। এই ধাক্কা দেয়ার জন্যে আমাকে কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে হলো, রবাহূতের মতোই জড়িয়ে পড়া।

যাই হোক, এই জড়ানো সার্থক হয়েছিল। বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সবাই শেষ পর্যন্ত ছায়াছবি তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তবু কাজটা সহজ ছিল না মোটেই, তিন লাখ

টাকার মধ্যে ত্রিশ চল্লিশ মিনিটের ছায়াছবি, যার স্যুটিং করতে হবে জনপদ থেকে বহু দূরে দুর্গম অরণ্যের অভ্যন্তরে। তার জন্যে উপযুক্ত লোকজন সংগ্রহ করাই দুষ্কর। দিনের পর দিন এমন সব এলাকায় ঘুরতে হবে যেখানে মানুষের স্থায়ী বসতি কখনোই গড়ে উঠতে পারেনি, কোনো খাদ্যশষ্য যেখানে উৎপন্ন হয় না, নৌযান ছাড়া যেখানে যাওয়া যায় না, খাবার পানিও যেখানে মেলে না, এমন দুরাঞ্চলে কেই বা যেতে চায়। তার উপর প্রাপ্তিযোগের আশা নেই। যে টাকার ডবলের বেশি খরচ করেও যেখানে পাতে দেয়ার মতো প্রামাণ্য ছায়াছবি তৈরি করা আজো কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি, সেখানে গোনা টাকায় হিসেব করে চলার কষ্ট কে-ই বা স্বীকার করতে চাইবে? ভাগে কর্মকাণ্ডে এমন কয়েকজন কর্মকর্তা জড়িত হয়েছিলেন, যাদের মুখের কথাতেই ভালো লম্বা লালফিতাকে একেবারে খাটো করা সম্ভব হয়েছিল। কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব ওবায়েদুল্লাহ খান, সচেষ্ট তথ্য সচিব খোরশেদ আলম এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দফতরের পরিচালক এম এ ওহাব আন্তরিক আগ্রহের পরিচয় না দিলে বাংলাদেশের বন্য প্রাণীর উপর প্রথম দেশজ ছায়াছবি নির্মাণের সূচনা হতে পরতো কিনা সন্দেহ। বনবিভাগের মহাপরিদর্শক হামিদ সাহেব এবং প্রধান বন সংরক্ষক মতিয়ার রহমান সাহেবের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। লালফিতার বন্ধনীতে সে চেষ্টা সীমাবদ্ধ হলেও নিয়ত চেষ্টায় বেস্টনি আলগা হয়েছিল, রক্ষা তাতেই সর্বরক্ষা করেছিলেন ওহাব সাহেব, খরচটাকে নিম্ন পর্যায়ে আনার ব্যবস্থা করে দিয়ে এবং আলোকচিত্র ধারণের দায়িত্ব একজন উদীয়মান ও কল্পনা কুশল শিল্পীর উপর অর্পণ করে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের উদীয়মান আলোকচিত্র ধারক তৌহিদ বাবু আমার অতি কাছের মানুষ। সে পরিচয় আগে জানা ছিল না তার সাথে পরিচয় ঘটলো চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দফতরে

ক্যামেরা অভিযানে বের হওয়ার চারপাঁচ দিন আগে খ্যাতিমান চরিত্রাভিনেতা সিরাজুল ইসলামের ঘরে বসেই পাণ্ডুলিপি বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। সিনেমা জগতের দর্শকদের বহুদিনের পরিচিত শিল্পী সিরাজ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা দু'দশকেরও বেশি দিনের। প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের বাজেট তিনিই তৈরি করে দিলেন। আমাদের হাতে সময় কম, গরম পড়ে আসছিল, মার্চের পরে সুন্দরবন রীতিমত বিপদশংকুল। বাঘ-সাপের চাইতেও তখন বেশি ভয় বিশাল বিশাল নদীর পাহাড় সমান উঁচু ঢেউ-এর। মার্চের সূচনা অর্থাৎ ফাল্গুনের মাঝামাঝি আসতে না আসতে সূর্যের তাপে সাগর গর্জাতে থাকে, সে গর্জনে ঢেউ ওঠে উদ্যত সাপের ফণার মতো মাথা তুলে সাগরের ঢেউ ঢুকে পড়ে সব নদীর ভেতরে।

সামনে যা পড়ে তাকে তলিয়ে দেয় সে ঢেউ, নৌকা, লঞ্চ এমনকি স্টীমারকেও। সাগর পাড়ের এই অরণ্যে নদী ছাড়া ঢোকা ও চলাচলের পথ নেই। তাই চৈত্রর গরমেও সুন্দরবনের নদী-খাল সবই ফুলে ওঠে। তখন সুন্দরবনে ফিল্মের স্যুটিং-এ যাওয়ার অর্থ বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দেয়া। এমন অভিযানের চিন্তায় রোমান্স আছে কিন্তু সঙ্গী জোটানো অসম্ভব।

সেজন্যে আমার তাগিদ ছিল মাস পয়লার আগেই বেরিয়ে পড়া। বাবুকে বোঝাতে দেরি হয়নি। পাণ্ডুলিপি আর 'রূপসী সুন্দরবন' বই পড়ে সে বুঝে নিয়েছিল তার করনীয় কাজ। বন্ধু সিরাজের বুঝবার কথা নয় সুন্দরবনের নৈসর্গিক অবস্থা। সাত দিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা সারতে হবে বলায় তিনি আঁতকে ওঠার ভাব দেখালেন। কপট বিস্ময় ভরে বলে উঠলেন বলেনকি তোহা ভাই, সাত দিনের ভেতর লম্বা কালার্ড ফিল্ম তৈরির সব ব্যবস্থা, আপনি যে কাবুলিওয়ালাদেরও ছাড়িয়ে গেলেন। নিজেরটা ছাড়া

আর কিছু বুঝতে চান না। শেষে সব কথা শুনে বুঝলেন। বুঝে ছিলেন ওহাব সাহেবও। তাই সাত দিনের বদলে তিন দিনে আনুষ্ঠানিকতার পর্ব শেষ করতে পেরেছিল।

এরপর যাত্রার দিনক্ষণ ঠিক করা আর নিজেদের তৈরি হওয়ার পালা। দু-চার দিনের ব্যাপারে নয় যে, এক প্রস্থ বাড়তি পোশাক আর লুঙ্গি-গামছা ব্যাগে ভরে হুট করে বেরিয়ে পড়া গেল। অরণ্যের পরিবেশ অরণ্যচারী প্রাণীদের ক্যামেরায় বন্দী করে আনা সপ্তাহ কেন মাস কাবার হতে পারে প্রথম পর্যায়ের কাজ সারতে। আবার ব্যাপারটাও দু-তিন জনকে নিয়ে নয়। অন্তত ডজনখানেক লোক চাই যাদেরকে চব্বিশ ঘণ্টা প্রায় আড়াই হাজার বর্গমাইল বিশিষ্ট সুন্দরবনের জনমানবহীন অরণ্যে ছুটতে হবে বন্য প্রাণীদের পিছে পিছে। অভিযাত্রী দলে ঢাকারই দু'জন আলোকচিত্রধারক তৌহীদ বাবু ও তার সহকারী আরশাদ, বনবিভাগের বন্য প্রাণী বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক আবদুল হামিদ। বাটলার সালাউদ্দিন ওরফে গপ্পু মিয়া, আমার সহকারী গাজী কামাল আর আমি।

সড়ক পথে খুলনা পৌঁছতে হবে। সরকারি হিসেব মতে দূরত্ব একশ নব্বই মাইল। গাড়ির ব্যবস্থা বন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষই করেছিলেন। স্যুটিং-এর সরঞ্জাম আর আমাদের ক'জনের বেডিং-সুটকেস মিলে বিরাট লটবহর আমাদের বাহন স্টেশন ওয়াগটার কলেবরে মধ্যমাকৃতির হলেও গহ্বরে ছোট ছিল না। মাল-মানুষের স্থান সংকুলানের অসুবিধা হতে পারেনি। বরং আমাদের আরামেই ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গাড়িটা। নতুন আমদানি করা গাড়ি। আমাদের আগে বোধ হয় দু'দফা সওয়ারী নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল।

দ্রুত গতি ও প্রায় নিঃশব্দ সঞ্চারের যন্ত্ররথ এগিয়ে চলছিল। শীত নেই, ভোরের বাতাসে মিষ্টি ঠাণ্ডা মন ভরিয়ে দিচ্ছিল। কুয়াশায় রাস্তার দু'পাশে বেশিদুর দৃষ্টি চলে না। তবু কুয়াশায়

চাপা পড়তে পারেনি যাত্রারম্ভের আনন্দ। সামনের দিন আর পথের কথাই আমরা বলাবলি করছিলাম পাশের সঙ্গীর সাথে। সে আলাপে ছেদ পড়লো আরিচাঘাটে পৌঁছে। চরে চরে প্রায় ভরাট আরিচা ঘাটে ফেরিস্টীমারে গাড়ি সমেত যমুনা পার হতে হবে। ফেরিস্টীমারে ঠাঁই পাওয়ার জন্যে আমাদের হুড়োহুড়ি করতে হয়নি। গাড়ির নম্বর প্লেট ও আরোহীদের পরিচয় সে ঝামেলা থেকে রেহাই দিয়েছিল।

ওপারে দৌলতদিয়া থেকে আবার আমাদের যন্ত্রযানের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করবে। মাঝখানে পৌনে এক ঘণ্টার মতো যমুনার বক্ষে বিহার। আনন্দ বিহার নয়, মেলার ঠেলাঠেলি বললেই মানানসই হয়। শ'পাঁচেকের মতো হরেক কিছিমের মানুষ আর নানা ধরনের শকটের সমাগম। এমন অবস্থার কোলাহল আমাকে অস্থির করে তোলে। তাই গাড়ির সিটে বসে দু'পাশের বিস্তীর্ণ চর ভূমির দৃশ্য দেখছিলাম। পুরানখ্যাত ব্রহ্মপুত্র নদের মূল জল-ধারাতেই উত্তর বাংলার এই যমুনা বিপুলা, এর ভয়ংকরী রূপ আমি দেখেছি জগন্নাথগঞ্জে ও সিরাজগঞ্জে। প্রলয়ংকর ভাঙনে প্রতিবছর নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে লোকালয়, ফসলীক্ষেত যার ক্ষতির পুরো হিসেব কখনোই হয়নি। গত তিন দশক ধরে কোটি কোটি টাকা খরচ করেও এ ভাঙন রোধ করা সম্ভব হয়নি। কেন হতে পারেনি সেটা বিশেষজ্ঞদেরই বলার কথা।

ফেরি স্টীমারের ওপর গাড়ির সীটে ফাল্গুনের যমুনা আরিচার ভাটিতে কংকালসার, দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাগত পল্লীবধূর চেহারাই মনে করিয়ে দেয়। আরিচার যমুনার দৃশ্য। অন্তত তাই ভেবেই আমার মন ব্যথিত হচ্ছিল, ভাবছিলাম যমুনা নদীর কথাই। 'যমুনা' নামটাই এই উপমহাদেশের মানুষের মনে কখন কিভাবে যে গেঁথে গেলো তার কূল কিনারা আমি বহু ভেবেও কোনদিন করতে

পারিনি। এক একটা নামের প্রতি এক এক অঞ্চলবাসীর কি যেন কি বিশেষ কারণে আকর্ষণ আছে। যমুনা হয়তো তেমনি একটা নাম, কত আদরিণী মেয়ের নাম যে যমুনা তা কেউ যুগ যুগ ধরে হিসেব করে বলতে পারবে না। বহু শিল্প পণ্যে এ নামের ছাপ আছে। এ নাম ব্যবহারের সুযোগ নিয়েছে বণিকরাও। ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে যমুনা নামের নদী একাধিক। মথুরা, দ্বারকা, প্রয়াগ, এলাহাবাদ ও আগ্রার যমুনা পৌরাণিক যুগ থেকে ইতিহাসের নানা ঘটনার মাধ্যমে যেমন বৈশিষ্ট্যময় তেমনি পুণ্যতোয়া রূপে কোটি কোটি হিন্দু নর-নারীর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গা ছাড়া এমন মর্যাদা আর কোন নদীর আছে কিনা জানি না। যমুনা স্নানে পুণ্য লাভ হয় এ বিশ্বাসে বিশেষ বিশেষ তিথিতে যমুনা নামের সব নদীতে 'স্নান যাত্রা' অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় গোবরডাঙ্গার কাছে যমুনা স্নান মেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম আমি কৈশোরে দেখেছি। সেই যমুনা ইছামতি নামে প্রবাহিত হয়েছে এবং আমাদের এই বাংলাদেশ ভূভাগে প্রবেশের পর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে নানাস্থানে নানা নামের পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু সাগর সঙ্গমে যমুনা আপন নামের প্রকাশ রাখতে পারেনি। নামের অবলুপ্তি সে ঘটিয়েছে প্রতাপদিত্যের যশোর রাজ্যের রাজধানী ধূমঘাটের সন্নিকটে। সেখানে পৌঁছে যমুনা ক্ষণকালের জন্যে গরবিনী হয়েছিল। প্রতাপদিত্যের পর যমুনা অবহেলা, ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ক্রমে সে মৃত্যুবরণ করেছে, ইংরেজ আমলে মাত্র শতবর্ষ কাল আগে বর্তমান ধূমঘাটে যমুনার নাম-নিশানা আর নেই।

'যশোর খুলনার ইতিহাস'-এ সতীশ চন্দ্র মিত্র যমুনার করুণ মৃত্যুর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে লিখেছেন, 'এই একদিন সে ঐশ্বর্য প্রতিভা ও রসরঙ্গ দেখাইয়াছিল আজ তাহার চিহ্নগুলিও বিলুপ্তপ্রায়। যে

যোজন বিস্তীর্ণ নদী প্রতাপের যশোর দুর্গের সমীপে অসংখ্য নৌবাহিনীর মাস্তুল সজ্জায় কণ্টকিত দেখা যাইত, আজ সে অভিশপ্ত নদী এক গাছি শীর্ণকায় খালের মত। কালের বিপর্যয়ে যমুনার অনেক বিপর্যয় হইয়াছে এবং তজ্জন্য খুলনার দক্ষিণাংশবাসী লোকসমূহের অবস্থান্তর ঘটিয়েছে।'

ছাত্র জীবনে শোনা একটা গানের কলি অকস্মাৎ বারবার মনে ধাক্কা দিচ্ছিল। মনে মনে আওড়াচ্ছিলাম 'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনার প্রবাহিনী কোথা সে রাসবিহারী বংশীধারী বামেতে রাই-বিনোদিনী, মন থেকেই জবাব আসছিল নহে নহে—নহে মথুরা প্রয়াগ ত্রিবেনির যমুনা আর আরিচা সিরাজগঞ্জ, জগন্নাথের যমুনা এক নয়। আবার এই যমুনার সাথে ধুমঘাট ঈশ্বরীপুরের যমুনার সম্পর্ক নির্ণয় করা কঠিন।

এই সব চিন্তা-ভাবনার শেষ না হতেই যমুনা পাড়ি দিয়ে আমরা দৌলতদিয়া পৌঁছে গেলাম। যমুনার পূর্ব পাড়ে ঢাকা, আমার জেলা পশ্চিমে ফরিদপুর। আমাদেরকে এ জেলার প্রায় ষাট মাইল পথ চলতে হবে। এ পথের শেষ কামারখালী গড়াই মধুমতীর মিলনস্থলে এপাড়ে ফরিদপুর ওপাড়ে যশোর জেলা, পদ্মা শাখা গৌরীবাগড়াই কামারখালীর ভাটিতে নাম বদল করে মধুমতী হয়েছে। একই নদী দুই নাম, আকার-প্রকারের ভিন্নতা। এমনটা কমই চোখে পড়ে। এই গড়াই-এর কুষ্টিয়া শহর, কবিগুরুর স্মৃতি জড়িত শিলাইদহ কুটিবাড়ির প্রান্ত স্পর্শ করে জলধারা গড়াই দিয়ে গড়িয়েছে। গড়াই প্রশস্ত আর মধুমতী ক্ষীণকায়া। ফেরি বিভ্রাটে আমরা ঘাটে আটকা পড়লাম। এদিকে বেলা দুপুর গড়িয়েছে। ইচ্ছে ছিল দিনের আহার খুলনায় পৌঁছে ধীরে সুস্থে সারবো, সে ইচ্ছায় বাধ সাধলো ঘাটের পাটনীরা। ঘন্টাখানিক কাবার হলেও তাদের কবল থেকে উদ্ধার মিললো না। অগত্যা ঘাটের হোটেলেই

দক্ষিণহস্তের কাজ সারতে হলো। শেষে অল ক্লিয়ার যখন মিললো সূর্য ততক্ষণে মধ্যে গগন পার হয়ে অনেকখানি পশ্চিমে নেমেছে।

ওপারে পৌঁছেও নতুন ঝামেলা। আমাদের যন্ত্রশকটের মাথা বিগড়েছে। ঘাটের উপরে উঠেই সে বিনা নোটিশেই থেমে গেলো। অপ্রত্যাশিত বিপদ। নতুন গাড়ি মাঝ রাস্তায় এমন কাণ্ড ঘটাবে এটা কেউ ভাবতে পেরেছিল। এমন বিপাকে আমাদেরও মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা। গাড়ি ঠিক না হলে আমাদের কামারখালিতে পড়ে থাকতে হবে। না ঘাটকা, না ঘরকা দশা, এদশা থেকে মুক্তি কিভাবে মিলবে তার কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। ব্যটারী খারাপ না। তেল পাস করছে না। তাই পরীক্ষার জন্যে গাড়ির মাথার ঢাকনি উঠানো হলো। না, ও দুটোয় গোলমাল নেই, তাহলে কি ইঞ্জিনে দোষ? চেক করতে করতে দোষ ধরা পড়লো তৌহিদের হাতে। বেশি কিছু নয়, ব্যাটারীর কাছে একটা তার নাজুক ছিল। সেটা ছিঁড়েই বিপত্তি। এ খুঁত মেরামত হলো কয়েক মিনিটেই। অতএব গাড়িও আবার ছুটতে আরম্ভ করলো।

কামারখালী থেকে খুলনা প্রায় একশ মাইলের পথ। এর মধ্যে থামাথামি নেই। কমছে কম তিন ঘণ্টার দৌড়। এই একটানা দৌড়েও বিরক্তি ছিলনা। দু'পাশে চলমান ছবি দেখতে দেখতে মনে পড়ছিল রবীন্দ্রনাথের কথা, 'নিস্তরঙ্গ গঙ্গার বুকে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই, সে বাংলার শোভা দেখে নাই।' নৌকা ভাসিয়ে নয় চলন্ত মোটর গাড়ির আরোহী হয়েই দেখেছিলাম বসন্তে বাংলার রূপ। প্রশস্ত মহাসড়কের দুপাশে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ রবিশস্যে ভরা। কোথাও শস্যে ফুলের হলুদ সমারোহ। কোনোখানে পাকা, আধাপাকা মুগ, মাসকলাই, মসুর, ছোলা প্রভৃতি ডাল ক্ষেতে রঙের মেশামেশি। মাঠের প্রান্তে গায়ের পাশে সবজিশাক, মুলার সাদা সাদা ফুল, সবুজ পাপড়ি পরা

বাধা ফপির সারি। বেড়া-ঘেরা, বেগুন, টমেটো, লংকা মরিচের ক্ষেত, এখানে ওখানে টুকটুকে লাল ফুলের গহনা পরে মাথা তুলে দাঁড়ানো শিমুল। গাঁয়ের ভিতরে মুকুল বা গুটি ও কচি পাতার সাজিপড়া আম, সজনে গাছে ঝুলন্ত ছোট ছোট ডাঁটা মাঝে মাঝে বাঁশ-বাবলার উঁকি—এ যেন কোন নিপুণ শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক অপরূপ ছবি।

গ্রাম বাংলার মন পাগল করা রূপ দেখতে গিয়ে আর কিছু চোখে পরেনি। এর মধ্যে মাগুরা নিঝাইদহ ও যশোর শহর আমরা কখন যে ছেড়ে এসেছি যে খেয়াল ছিল না। হুঁশ হলো রথ হঠাৎ থেমে যেতে। গন্তব্যস্থলে পেঁৗছে নয়, যশোর শহরের উপকণ্ঠে আকস্মিকভাবে।

আমাদের সড়ক পথে দৌড়ের শেষ পর্যায়ে যশোর থেকে খুলনার পথ প্রায় চল্লিশ মাইল। আমরা ঘন্টাখানেকের মধ্যে পেঁৗছে গেলাম। উঠলাম সরাসরি বিভাগীয় কর্মকর্তার দফতরে। সুন্দর বনের বিভাগীয় প্রধান গোলাম হাবিব সুঠাম দেহী পুরুষ। অপ্রিয় সত্য বলার জন্যে নাম কিনে বরিশাল থেকে খুলনায় বদলি হয়েছেন বছর দেড়েক আগে। বিয়ে করেননি। অফিসের কাজ নিয়েই সারাদিন এবং রাতেও অনেকখানি কেটে যায়। সূর্যটা পশ্চিম আকাশের শেষপ্রান্ত রেখায় পেঁৗছে দালান কোঠা ও গাছ-গাছালীর পিছনে ডুব মারলেও গোলাম হাবীব অফিসেই ছিলেন। আমাদের চিত্রগ্রহণের খবর ও সদস্যদের নামের তালিকা আগেই ঢাকার বন বিভাগীয় প্রধান দফতর থেকে খুলনায় সুন্দরবন বিভাগীয় সদর কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেই সাথে নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল। আমাদের তিন সপ্তাহকাল সুন্দরবনে অবস্থানের সময় চলাচলের জন্যে লঞ্চ, খাওয়া থাকা ও পাহারার যাবতীয় ব্যবস্থা

করতে। এ ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হিসেবে গোলাম হাবিব সাহেবের। আমাদের সফরের সব খরচ তিনি যোগাবেন এছাড়া জনমানুষের বসতহীন দুর্গম এই অরণ্য ভূমিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রশ্ন ছিল। অরণ্যচারী পশুদের প্রাকৃতিক পরিবেশে ক্যামেরায় ধরতে হবে। কোনো এক স্থানে শিবির গড়ে এটা সম্ভব নয়। যার যেখানে আস্তানা তাকে সেখানে গিয়েই চিত্রবন্দী করতে হবে। এদের মধ্যে আবার বনরাজের দর্শন লাভ ভাগ্যের কথা। তিনি সঙ্গোপনে সবাইকে দেখেন, কিন্তু সহজে কাউকে দেখা দিতে চান না। সুতরাং আমাদের ছুটতে হবে প্রায় আড়াই হাজার বর্গমাইল বিশিষ্ট এই বনভূমির একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি। এ আবার এমনি অরণ্য যেখানে পায়ে চলার পথ পর্যন্ত নেই। জোয়ার ভাটার নিত্যকার খেলায় খেলে চলে সুন্দরবনের সব নদী-খাল। এইগুলোই এই উপকূলীয় আরণ্যক অঞ্চলে চলাচলের একমাত্র পথ।

এমন পাণ্ডব বিবর্জিত স্থানে জনযানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ব্যতিরেকে নঃ যযৌ, 'নঃ তস্থৌ' অবস্থা অবধারিত। আমাদের চলতে হবে বন বিভাগের জলযানের আরোহী হয়ে। এই জলযান যার আওতাধীন। তিনি সুন্দর বনের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার। যাঁর অঙ্গুলি হেলন ব্যতিরেকে সুন্দর বনের গাছগাছালীর একটি পাতাও নড়তেও বোধ হয় ভয় পায় এবং একটি বৃক্ষের অপমৃত্যুতেও তুল-কালাম কাণ্ড হতে পারে। আমাদের এই সরকারী কর্মকাণ্ডও তাঁর সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা ভিন্ন সফল করা সম্ভব নয়।

খুলনায় আপ্যায়নের বিন্দু মাত্র ত্রুটি ঘটতে পারেনি।

সুন্দরবনের নলিয়ান রেঞ্জ আজ খুলনা রেঞ্জ নামে পরিচিত। সুন্দরবন 'ডিভিশনের' সবচেয়ে পয়মন্ত এই রেঞ্জ বছরে পাঁচ-ছয় কোটি টাকা রাজস্ব যোগাচ্ছে। রেঞ্জের প্রধান কর্মকর্তা সেলিম খান

আমার ভাইপোর ছেলে। স্টাফের বেতন নিতে ও রাজস্ব জমা দিতে সেলিমই এসেছিল, ডি, এফ, ও'র অফিসেই তার সাথে দেখা হয়ে গেলো। অচলাবস্থা দূর করার পথ তার ফলেই পেয়ে গেলাম। মনে মনে ঠিক করলাম এর লঞ্চটাকেই পাকড়াবো। 'বনমৃগী' চঞ্চলা না হলেও মোটামুটি ভালই চলে। ইংরেজ আমলের এই লঞ্চটার পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় কেটেছে সুন্দরবনে ঘোরাঘুরি করে। এর আগেও দু'বার 'বনমৃগী' আমাকে সুন্দরবনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যাওয়ার পথে বহু তথ্য যুগিয়েছে।

গোলাম হাবীব সাহেবকে বললাম, নষ্ট করার মত সময় আর নেই। মার্চ মাসের কয়েকদিন চলে গেছে। এরপর বেশি গরম পড়লে বাতাস ছাড়বে, ঢেউ বাড়বে। সুন্দরবনের বিশাল বিশাল নদীর উথাল-পাতাল সেই ঢেউ ভেঙ্গে লঞ্চ চালাতে অভিজ্ঞ সারেংরাও ইতস্তত করে। এমন আবহাওয়ার দুর্গম অরণ্যে, যেখানে জলপথ ছাড়া আর কোনো পথ নেই, জনবসতিও নেই, সেখানে মুক্ত বন্য প্রাণীর চলমান ছবি উঠানো দুঃসাধ্য। গোলাম হাবীব সমস্যাটা বুঝলেন। সুতরাং 'বনপক্ষী' ঠিক না হওয়া পর্যন্ত 'বন-মৃগী' ব্যবহারের প্রস্তাব তিনি সানন্দে অনুমোদন করলেন। ঠিক হলো, এই লঞ্চেই আমরা যাবো। নলিয়ান হয়ে নীলকমল অর্থাৎ হীরন পয়েন্ট গিয়ে আমরা 'বন পক্ষীর' অপেক্ষায় থাকবো। সে পৌঁছালে 'বনমৃগী' আমাদের কাছ থেকে মুক্তি নিয়ে তার নির্দিষ্ট পথে বন বিহারে যাবে। ছক বাধা বিভাগীয় কর্মসূচীর বাইরের টিপে লঞ্চ চালক ও ক্রুদের একটা অনীহার ভাব আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি। কারণ এ ধরনের সফরে অতিরিক্ত প্রাপ্তি যোগ নেই। অথচ নির্দিষ্ট কর্মসূচীর সফরে প্রত্যেক ষ্টেশন ও কূপ থেকে অল্পবিস্তর উপরি পয়সা মেলে। এই বাড়তি আয় মাসিক বেতনের চেয়ে অনেক বেশি। তাই ছকের বাইরে টিপে ঘন ঘন লঞ্চ বিগড়ায় এবং

সারেংরা অতিমাত্রায় দোহাই পড়ে। 'বনমৃগী'র এ যাত্রায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

আমাদের নাছোড়বান্দা ভাব আর সেলিমের চাপে 'বন মৃগী' ফিল্ম পার্টি নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছিলো। খুলনা থেকে দুপুরের পরে রওনা দিয়ে নলিয়ান পোঁছাতে আমাদের একটু রাত হয়ে গিয়েছিল। রাতে এখানেই আমাদের থাকতে হবে। এপার ওপারের গাছ-গাছালি সব খালি চোখে আবছা দেখায়, এমন চওড়া শিবসা ও বুড়ো ন'লেন গাঙের মিলনস্থলে নলিয়ান তথা ন'লেন রেঞ্জ অবস্থিত। সুন্দরবনের সব ফরেস্ট অফিসের অবস্থানই নদীর সঙ্গম স্থলে। এক পারে লোকালয়, অন্য পারে বনভূমি। এমন বৈশিষ্ট্যময় নদী সঙ্গমেই এসব অফিস। তবে নলিয়ান সে বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে বুড়ো গাঙ মরে যাওয়াতে। ন'লেনের কোনো পারে, কোথাও আজ বন নেই। নদীর মরণের শোকে বনেরও মৃত্যু ঘটেছে।

রেঞ্জ অফিসে রাত এবং পরদিন দুপুর অবধি কাটিয়ে 'বনমৃগী' ফিল্ম ম্যুটি অভিযানের সূচনা করলো। 'আমাদের যাত্রা হল শুরু ওগো কর্ণধার।' 'এখন বাতাস উঠুক, তুফান উঠুক ফিরব না তো আর'—কবিগুরুর গানের এ দুটো লাইন মনে মনে আউড়ে আশায় বুক বাধলাম।

ভাটার টানে লঞ্চ দ্রুতই এগিয়ে যাচ্ছিলো। দেড়-দু'মাইল চওড়া নদীতেও একটানা চলার উপায় নেই। একটু পর পরই শুধু বাঁক ও চর। সেজন্যে স্রোতও এলো-মেলো। লঞ্চ তাই চলছিল কখনো ওপারের তীর ঘেঁষে। কখনো ওপারের তার ঘেঁষে কখনো বা মাঝ নদীর বুক চিরে। আধ ঘণ্টা পার না হতে আমরা লোকালয়ের সংশ্রব ছাড়লাম। নদীর পারেই ঝাড় বন। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় দৃশ্যমান পূর্ব পারের দিকে

আমরা নিজেদের ও ক্যামেরার চোখ ফিরিয়ে রাখলাম। ছায়াময় পশ্চিমের আবছা দৃশ্য ধরে রাখার শক্তি আমাদের মুভি ক্যামেরার ছিল না। সোনালী আলোয় ঝলমল করে ওঠা পূর্ব ভাগের বন ভূমির অপরূপ শোভা আমাদের মন ভরে দিচ্ছিলো। সুন্দরবনের রূপ চব্বিশ ঘণ্টায় অন্তত চারবার পাল্টায়। প্রভাতে স্নিগ্ধ শ্যামল, মধ্যাহ্নে উতলা ধূসর, অপরাহ্নে রমণীয় সোনলী আর নিশিথে কৃষ্ণ কলির সাজপরা এই বনভূমি। বাবু ও আরশাদ সেই মনোহর দৃশ্য যতদুর সম্ভব ক্যামেরায় ধরে রাখতে তৎপর ছিল। বরুণ দেবের দুরন্ত টান ভাটা। সে টানে 'বনমৃগী' আমাদের নিয়ে সামনে সাগর পানে ছুটে চলছিল। গহীন শিবসা বিপদসংকুল এই নদী বিলীন হয়েছে ভয়াল মর্জালের বুকে আছড়ে পড়ে। মর্জাল বজ্জাতও। তার বজ্জাতিকে ডরার না এমন লঞ্চ চালক আমি কম দেখেছি। ফেব্রুয়ারীর পরে 'বনরানী,' 'বনকন্যার' মত শক্তিরূপিনীদের পর্যন্ত মর্জালের মর্যাদা রেখে চলতে হয়। দুর্বিনীত মর্জাল আর বিশাল পসর গলাগলি করতে করতে একেবারে মিশে গেছে নীল কমলে এসে। সার্থক নামটা কে দিয়েছিল তার উল্লেখ কোনো বইয়ে নেই। তবে তিনি যেই হোন না কেনো তাঁর মন নিঃসন্দেহে অসামান্য কাব্যময় ছিল। দুই দিগন্ত বিস্তৃত নদীর মিলিত প্রবাহ যেখানে সাগরের নীলাভ জলরাশির সাথে মেশামেশি করতে গিয়ে বন-বনানীর সবুজ রক্ত লাল ও কচি কলাপাতার মিলিত রঙের ছায়ায় অঙ্গসজ্জা করেছে সেখানকার শোভা নীল- কমলের রূপের মতোই।

এখানে গাছ-গাছালি ও পাখ-পাখালির মেলায় বাঘ, হরিণ, বানর প্রভৃতি চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরও সদলে উপস্থিতি আছে। হরিণের রাজ্য বলেও নীলকমলের সুখ্যাতি আছে। পাকিস্তান আমলে পশ্চিমারা এখানে হরিণের পাল দেখে 'হরণ হরণ' বলে চিৎকার

করে উঠতো, এই চিৎকারের ফলশ্রুতিতে 'নীলকমল' নামটা হারিয়ে যেতে বসেছে। পাকিস্তানের কথার ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে স্থানটি তার আদি মনোগ্রাহী নাম খুইয়ে 'হীরন পয়েন্ট' এই বিজাতীয় নামের পরিচয়ে পরিচিত হতে চলেছে।

সন্ধ্যার আগে নীলকমল পেঁছিতে হবে আমাদের। তা না পারলে রাত কাটানো সমস্যা হবে। চৌদ্দ-পনের জনকে রাতে ঠাঁই দিতে পারে এত বড় কোল 'বনমৃগী'র নয়, খালাসিরা বাদে বড়জোর পাঁচ জন এ লঞ্চে ঘুমাতে পারে। বাকি দশজনকে থাকতে হবে ফরেষ্ট স্টেশনে ও পোর্টের রেষ্ট হাউজে সিট ভাগাভাগি করে। আমরা তাই সময় বাঁচাতে উদগ্রীব ছিলাম। তবুও আমাদের ঘণ্টা-খানেক সময় কাড়লো বুনো হাঁসেরা। দু-চারটে কি দু-চারশো নয়, হাজার হাজার বালি হাঁসের ঝাঁক বসেছে নদীর কালো বুক আরো কালো করে। শিবসার শেষ আর মাজালের শুরু যেখানে তার একটু উজানে ওরা পরমানন্দে আহার বিহার করছিলো ভেসে ভেসে। লঞ্চের শব্দে ওরা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তবু কেন জানিনে, দুরে পালাচ্ছিল না। উড়ে একটুখানি সামনে নিরাপদ দুরত্বে সরে থাকছিলো। আমরা সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ফেললাম। বাবু ও আরশাদ উড়ন্ত ও ভাসমান বালি হাসদের চমৎকার শর্ট নিলো চলন্ত লঞ্চ থেকে। এর মধ্যে মাংসাশীদের চাঞ্চল্য দেখা দিল। বনরক্ষীদের মধ্যে কয়েকজন পাকা শিকারী ছিল। তারা আবদার তুললো, ঝাঁকের উপর গুলি ছুঁড়ে কয়েকটা হাঁস মেরে খাওয়ার। সহযোগী বনরক্ষক হামিদের বন্দুক চালানোর অভ্যাস ছিল। পাখি মারার তালে সে তাল ধরে বললো, দেন না চাচা আপনার বন্দুকটা মারতে পারলে রাতের খাওয়াটা মজাদার হবে। আমি তার কথায় কান না দিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রইলাম।

আমার ভাইপো সলিম ও হামিদ একই ব্যাংকের অফিসার।

সলিমের চাচা জেনে হামিদও আমাকে চাচা ডাকতে আরম্ভ করেছিল। আমার নির্লিপ্তভাবে নিরাশ হয়েও সে হাল ছাড়েনি। সলিমের ছোট ছেলে রাঙ্গু লঞ্চে আমাদের সাথেই ছিল। হামিদ তাকেই উস্কে দিল। বালি হাঁস শিকারে আমাকে রাজি করানোর জন্যে। রাঙ্গুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় ছিল না। বন্দুক টানাটানি করে সেই আবদার জুড়ে দিল। 'দাদু আপনি মারেন না'' বলে। শেষ পর্যন্ত তাকে ঠাণ্ডা করতে কার্তুজ বের করতে হলো। গুলি ভরে কেবিনের বাইরে এসে নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললাম। চলন্ত লঞ্চ থেকে গুলি করে বালি হাঁস শিকার করা যে আমার কর্ম নয় তা বুঝে গুলি ভরা বন্দুক হামিদের হাতেই দিলাম। হামিদ তাক করে ট্রিগার টিপলো। ঘায়েল হলো মাত্র একটা, হাজার হাঁসের ঝাঁকের মধ্যে একটা মাত্র নদীর পানির উপরে পড়ে থাকতে দেখে আমরা সবাই হতাশ হয়েছিলাম। ছয় নম্বরের বিদেশী গুলি লক্ষ্যস্থল অবধি পৌঁছেও নিম্নতম সাফল্যের বেশি অর্জন করতে পারলো না তা আমরা ভেবেই পাচ্ছিলাম না। তবু ''হাতের একটা একটা পাখি বনের দশটা পাখির চেয়ে মূল্যবান'' এই প্রবচনকে বেদবাক্য ধরে নিয়ে আমরা ওই একটা পাখির দিকে লঞ্চ নিয়ে ধাবিত হলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য লঞ্চ কাছে ঘেঁষার আগেই ঘায়েল হাঁসটা ডুব মারতে আরম্ভ করলো। এক ডুবে চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ পার হয়ে সে ডুব সাঁতারে পারদর্শিতাই শুধু দেখাচ্ছিল না, আমাদেরকেও রীতিমত হয়রান দিচ্ছিল। প্রায় আধ ঘন্টা ডুবোডুবি করে সে নিস্তেজ হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল।

বালি হাঁসের ঝাঁক তখনো আমাদের নজরের বাইরে চলে যায়নি, উড়ে একটু সামনে গিয়ে নদীর বুকে নেমেই আবার ভাসতে আরম্ভ করেছিল। ওদের দেখে আমাদেরও লোভ বেড়ে গিয়েছিল। লঞ্চের মুখ ভাসমান বালি হাঁসের দিকে ফেরানো হলো। একটু কাছাকাছি

হতে হামিদই গুলি করলো। ফল একই। একটাই ঘায়েল। কিন্তু পৌনে এক ঘণ্টা ধাওয়া করেও তাকে ধরা গেল না। ডুব সাঁতারের বাহাদুরিতে এই জখম বালি হাঁসটা যান্ত্রিক জলযানের আরোহীদের হারিয়ে দিন শেষের ডুবটা দিয়ে তীরের গাছগাছলির পানিতে নেমে যাওয়া ঘন শিকড়ের মধ্যে সে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো। অগত্যা নিরুদ্দিষ্ট বালি হাঁস বনবিবি নমো করে আমরা নীলকমলের উদ্দেশ্যে আবার লঞ্চ ছুটালাম।

আমরা সময় ঠিক রাখতে পারিনি। নীলকমল পৌছাতে সন্ধ্যা উতরে গিয়েছিল কিন্তু যত ভয় করেছিলাম, অসুবিধা ততখানি হয়নি। ফরেষ্ট স্টেশনের লোকজনই সব মুশকিল আসান করে দিল। স্টেশন অফিসার শামসুল ইসলামের বাড়ি আমাদের পাশের গ্রামে। দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ শামসুলের মতো কাজেকর্মে চৌকস—লোক আমি কমই দেখেছি। তার কর্ম তৎপরতায় আমাদের দলের থাকার চমৎকার বন্দোবস্ত হয়ে গেলো। হীরন পয়েন্ট তথা নীলকমলে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষের চমৎকার একটা দোতলা রেষ্ট হাউজ ছাড়াও পোর্টের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের থাকার জন্য বেশ কিছু কোয়ার্টার, একটা বিশাল দীঘি, ভলিবল ও ব্যাডমিন্টন খেলার কোর্ট আছে। বন্দর কর্তৃপক্ষের পাইলট জাহাজের ক্যাপ্টেনরা ডিউটির মধ্যবর্তী সময়ে রাত কাটাতে হীরন পয়েণ্টে আসেন। টেলিফোন ও ওয়ারলেসের মাধ্যমে মংলা, খুলনা ছাড়াও সারা দেশের সাথে নীল কমলের যোগাযোগ আছে। ঐসব বিভাগের কয়েকজন কর্মচারিও এখানে থাকেন। তবে সপরিবারে কোনো বিভাগের কেউই ত্রিমোহিনীর এই সুন্দর সাগরকূলে থাকতে সাহস রাখেন না সেটা কেবল জনপদ থেকে বিছিন্ন থাকার জন্য নয়।

"নিস্তরঙ্গ গঙ্গার বুকে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার শোভা দেখে নাই।"

রবীন্দ্রনাথের এই কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, সমুদ্রোপকূলে পাখির কুজন ও শ্বাপদের গর্জন মিশ্রিত বনময় দীপাঞ্চলের অপরূপ দৃশ্য যারা দেখেননি তারাও অরণ্যের আসল রূপ দর্শন থেকে বঞ্চিত। এ বাংলার বিশেষ রূপ এবং শোভা তারাই বর্ণনা করতে পারবেন, যারা চোখ-কান খোলা রেখে সব দেখেছেন, শুনেছেন। এই স্থানে থাকার ব্যবস্থা শামসুল ইসলামের প্রচেষ্টায় হয়ে গিয়েছিল। সেলিম রাঙ্গু ও গার্ডদের নিয়ে ডেরা বাঁধলো ফরেস্ট অফিসের ঘরে। হামিদ সাহেব ও আমি লঞ্চেই রাত কাঠাবো বলে ঠিক করে নিলাম।

সবাই শ্রান্ত ক্লান্ত থাকায় রাতের মজলিস বসতে পারলো না। আমাদের রান্না ও খাওয়ার ব্যবস্থা লঞ্চেই হচ্ছিল। সুতরাং ভোজন পর্ব ভালোই হলো। এর মধ্যে বালি হাঁসের মাংসও ছিল। খাওয়ার পরে দু'চোখ ভেঙ্গে নেমে এলো ঘুম।

কাজ আরম্ভ হলো পরের দিন সকাল হতে। বাঘ যেখানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতো সেখানে পায়ের দাগ যথেষ্ট চোখে পড়লো। কিন্তু বনের রাজার চেহারা দেখা গেলো না। একজন খবর দিল একটু দূরে সাগরের কিনারে বালুর চর নামক স্থানে বাঘ বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বাঘের ভয়ে সেখানকার জেলেরা আগে থাকতেই মাছ ধরা বন্ধ করে অন্যত্র চলে গেছে। আমরা লঞ্চ ছাড়লাম। পথে বানর দু-চারটের বেশি চোখে পড়লো না। একটা কুমিরের বাচ্চা দূর থেকে ইঞ্জিনের শব্দ শুনেই নদীতে নেমে গেলো আমাদের ক্যামেরাকে ফাঁকি দিয়ে। বালু দ্বীপে পৌঁছালাম। এলাকা ঘুরে জোড়া বাঘের পায়ের চিহ্ন চোখে পড়লো। এর মধ্যে একটু দূর হতে হরিণের ভয়ার্ত ডাকের শব্দ কানে এলো। জব্বার মোল্লা ও বন-বিভাগের সবাই অনুমান করলো নিশ্চয়ই বাঘ কাছাকাছি আছে, তাই হরিণ এমন আওয়াজ করে পালাচ্ছে।

ডাক যে দিক থেকে আসছিল লঞ্চ নিয়ে সেদিকে গেলাম। কিন্তু

জঙ্গলের ভিতর কয়েক ঘণ্টা বৃথাই কাটিয়ে ফিরে এলাম। পর পর কয়েক দিন এভাবেই কাটলো।

নীলকমলে আমাদের ছটি দিন বৃথাই কাটলো। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও বিভিন্ন জাতের পাখি ও শূয়োরের ছবি তুলেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হলো। বাঘের কথা অনেকেই বললেও ঐ জন্তুটার দেখা পাওয়া গেলো না। পাইলট জাহাজের এক ক্যাপ্টেন বললেন, তিনি একটি বাঘকে দেখেছেন এখানকার বিশাল নদী সাঁতরে পার হতে। বাঘটি তাদের জাহাজের এত কাছে এসেছিল যে সেটার গলায় দড়ি পরানোও কঠিন ছিলো না। কিন্তু আমাদের লঞ্চের সারেং প্রবল ঢেউ-এর জন্যে তার জলান ছাড়তে রাজি হলো না।

ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের প্রতিশ্রুত লঞ্চ শেষ পর্যন্ত এসে ভিড়লো। সারেং করম আলী স্টিল বডির সেই নৌযান 'বনপক্ষী' নিয়ে হাজির হলো। লঞ্চটা আসলে খুবই ছোট। এমন যান ব্যবস্থা হবে সেটা ভাবনারও অগোচরে। অবাক হলেও উপায়হীন অবস্থা। বনপক্ষীই নিতে হলো। সুতরাং আমাদের সামানপাতি 'বনমৃগী' থেকে এই লঞ্চেই উঠানো হলো।

মর্জালের পশরে প্রচণ্ড ঢেউ। এই নদী পেরিয়ে আমাদের যেতে হবে পূবে। কয়েক মাইল চওড়া নদীর মিলনস্থল পাড়ি দিতে 'বন মৃগী' সারেং রাজি হলো না। কিন্তু করম আলী সাহসী। তার কথা, চলুন স্যার, ইনশাআল্লাহ অসুবিধা হবে না। সেলিমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রওনা হলাম।

লঞ্চ চলছিল আমাদের দোল খাওয়াতে খাওয়াতে। ভাবছিলাম কপালে যা আছে ঘটবে। কিন্তু কিছুই ঘটলো না শেষ পর্যন্ত। নদীর বিশাল বুক পাড়ি দিয়ে অন্য পারে পৌঁছতে ভয় কাটলো। এর পর নদীগুলো তুলনামূলকভাবে ছোট। সুতরাং 'বনপক্ষী' একটানা চলছিল। মাঝখানে একবার আমরা পথ হারালেও লঞ্চ

ঠিকই কচিখালিতে পৌঁছলো। কচিখালির আর একটা নাম টাইগার পয়েন্ট বা বাঘের কণা। কচিখালিতে থাকার ব্যবস্থা বন অফিসের একটা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়িতেই করতে হলো। খাওয়া দাওয়ার কাজও বন অফিসের ঘরে। জিনিসপত্র ছিল, দরকার মতো মাছও মিলে গেলো। রান্নার লোকও আমাদের ঘরে ছিল। তাই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও কেনো সমস্যা হলো না।

লঞ্চটাকে পাশের একটা খালের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা হলো। বন অফিসের স্টেশন অফিসার মকবুল সাহেব আমাদের পেয়ে মহাখুশি। তিনি তাঁর স্টাফদের নিয়ে আমাদের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল বাঘের ছবি নেয়া। কচিখালি সাগরের কূলেই অবস্থিত। এখানে বিশাল একটা খড় বন আছে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ জুড়ে। খড় বনের পরেই বঙ্গোপসাগর। এখানে জেলেরা মাছ ধরতে এসে ডেরা বেঁধেছে। সকালে উঠে আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে। অতএব রাতের বেলা সময় নষ্ট না করে ঘুমালাম।

কচিখালি পাখপাখালি ও জীব-জন্তুতে ভরে আছে। সকাল বিকাল হরিণরা দল বেঁধে আসে ঘাস পাতা খেতে। আসে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে। অফিস ঘরে বসেই দেখা যায় প্রকৃতির অনাবিল পরিবেশে মৃগ-মৃগীরা আপন মনে খেয়ে বেড়াচ্ছে। বাঘের প্রধান খাদ্য হরিণ। সুতরাং এখানেও বাঘের আনাঘোনা যথেষ্ট। টাইগার পয়েন্ট নামটি তাই যথার্থ হয়েছে। এখানে আমি আগেও দু'বার এসেছি। একবার কচিখালিতে জঙ্গল বিট করে জন্তু জানোয়ার গণার কাজেও অংশ নিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন বিজ্ঞান গবেষণা-গারের কর্মকর্তা বেগ সাহেব ও পর্যটন কর্পোরেশনের বিশিষ্ট ক্যামেরাম্যান বিজন সরকার। লোক যোগাড় করা হয়েছিল নদী ও সমুদ্রে মাছ ধরতে আসা জেলেদের মধ্যে থেকে। বন বিভাগের

বোটম্যান এবং গার্ডরাও সহযোগিতা করেছিল। সাত-আটটা রাইফেল বিটারদের হাতে দেয়া হয়েছিল। পাঁচ-ছজন লোক অন্তর একজনের কাছে রাইফেল এই ভিত্তিতে অগ্নেয়াস্ত্র বণ্টন করা হলো। আমরা মানে বেগ সাহেব, বিজন বাবু ও আমি মাঝ মাঠে একটা গাছে চড়লাম। বনবিভাগের ওমর আলী, রশীদ বয়াতি ও আরো কয়েকজন ছিলেন কাছাকাছি।

এত লোক নিয়েও বাঘ দেখা ও ছবি নেয়া সম্ভব হয়নি। বিটার-দের জঙ্গল পেটানোতে জন্তু জানোয়াররা ভড়কে গিয়ে পলায়নের জন্যে দৌড়ে বেরিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু বেশীর ভাগই যাচ্ছিল বিটারদের পাশ কাটিয়ে পিছন দিকে। সামনের দিকে ছুটছিল বেশ কিছু হরিণ। আমরা কেবল তাদের ছবিই নিতে পেরেছিলাম। বেশির ভাগ জন্তুই চলে যাচ্ছিল পিছনের দিকে। বাঘ, হরিণ, বন বিড়াল প্রভৃতি জন্তু, বনমুরগী-মোরগ, গুঁইসাপ এবং আরো কয়েক প্রকার পশু পাখি যাচ্ছিল উল্টো দিকে। বাঘ সেবার তিনটি বেরিয়েছিল। একটা বাঘ এক রাইফেলধারীর কাছাকাছি হতে না হতে সে বেচারা ঘাবড়ে যায় ও হঠাৎ তার রাইফেল থেকে গুলি বেরিয়ে যায়। জঙ্গলে গুলির আওয়াজ তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে-ছিল। সব জন্তুই ছুটাছুটি করতে করতে পালাচ্ছিল। বাঘ-হরিণ এক সাথে দৌড়াতে আরম্ভ করলো। বাঘেরা লাফ দিয়ে বেরিয়ে পিছন দিকের জঙ্গলে ঢুকলো। সে দৃশ্য আমরা দেখতে পাইনি। বিটারদের কাছে শুনে আক্ষেপ করেছিলাম। যে তিনটে বাঘ বেরিয়েছিল তার ছবিও আমরা তুলতে পারলাম না। বেগ সাহেব ও বিজন বাবু পলায়মান হরিণের পালের কয়েকটা ভাল ছবি উঠিয়েছিলেন। এসব ছবির কিছু কপি আমাকে তারা দিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, কচিখালিতে ডেরা বেঁধে আমরা সুন্দরবনের খাস পাহারাদার বড়মিয়ার সন্ধানে লেগে গেলাম। বাঘের পায়ের

চিহ্ন সবখানে থাকলেও ঐ জন্তুর নিশানা চোখে পড়লো না। দিন দুয়েক সকাল বিকাল নিষ্ফল চেষ্টার পর, জব্বার মোল্লা বললো, চলেন ফটকার দিকে যাই। ওখানে বড় মিয়ার যাতায়াত খুবই। জব্বারের কথাটা আমার মনে ধরলো। কারণ একদিন ফটকাতে আমাদের নজদিক থেকেই হরিণের পালের ওপর লাফিয়ে পড়ে বাঘ তার একটা শিকার ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

কচিখালি অর্থাৎ টাইগার পয়েন্ট আমাদের ফটোগ্রাফি ভালই হয়েছিল। সাগরের কূলে নানা জাতের পাখির সমাগম, স্নান ও শিকারের দৃশ্য বাবু চমৎকার তুলেছিল। টুনটুনি পাখির বাসা বাঁধার দৃশ্যও কামেরায় ভাল ধরা পড়েছিল। আর ছিল হরিণ, বানর ও গুঁই সাপের অবিরাম আসা যাওয়ার ছবি।

যাই হোক সরু খাল দিয়ে ফটকা পেঁৗছতে আমাদের দুপুর গড়িয়ে গেল। বিকেলের দিকে বড় মিয়ার সন্ধানে বের হলো সবাই। অবশ্য আমরা কয়েকজন ফরেষ্ট অফিসারের দুটো ঘরে ডেরা পেতে বসলাম। জব্বার বিখ্যাত বাঘ শিকারী পচাব্দী গাজীর ছোটভাই হাশেম গাজী ও নঈমুদ্দিন বয়াতি রাইফেল ও বন্দুক নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকলো। তিনজনই পাকা শিকারী। প্রত্যেকেই কয়েকটা করে বাঘ শিকার করেছে। সুতরাং আমরা বাঘের হদিস সম্পর্কে নিশ্চিন্তই ছিলাম। কিন্তু আশা মাটি হওয়ার নজির পেতে বেশি দেরি হলো না। ঘণ্টা খানেক পরে তিনজন দ্রুত পায়ে ফিরে এলো হাঁফাতে হাঁফাতে।

হাশেম বললো, স্যার 'বড়কর্তা' মুড়ি করছে। বাঘ শিকার ধরে প্রথম ভর পেট খাওয়ার পর অবশিষ্টাংশ লুকিয়ে রাখে। এই লুকানো খাদ্যকে স্থানীয় লোকে মুড়ি করা বলে থাকে।

ওরা তিন জনই বললো, যা ঝোপঝাড় তাতে নজর চলে না। বেলাও ডুবে আসছে কোন দিক দিয়ে হামলা হয় ঠিক নেই। কাল

সকালের দিকে খোঁজ নেওয়াই ঠিক হবে ভেবে আমরা ফিরে এলাম।

কিন্তু কপাল আমাদের নেহাৎ মন্দ। সকালে উঠে ক্যামেরা চেক আপ করতে গিয়ে দেখা গেল ব্যাটারী ডাউন। অতএব সব পণ্ড। মংলায় জানলাম ফিরে গিয়ে চার্জ না দিলে কাজ হবেনা। সুতরাং সব গাটরী বেঁধে বন্দর অভিমুখে রওনা হলাম।

এদিকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সার্কেলের প্রধান নূর মোহাম্মদ সরকার আমাদের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। তাঁর সাথে দেখা হলো মংলার উল্টো দিকে টাইনমারি ফরেষ্ট অফিসে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষক উঁচু পোস্ট। তার আগমনে হৈ চৈ লেগে গোলো। আমাদের প্রধান কাজ ছিল বাঘের খোঁজ নেয়া। স্টেশন অফিসারকে ডেকে খোঁজ নিলেন সরকার সাহেব। দু'বছরে তেত্রিশটা মানুষ বাঘের হাতে মারা পড়েছে বলে রিপোর্ট আছে। বিনা রিপোর্টে মরা আরো অনেক।

আমি ও সরকার সাহেব স্পীড বোট নিয়ে বনের ভেতর দিয়ে অবস্থা দেখতে বের হলাম। চার-পাঁচ জায়গায় দেখলাম গাছে কাপড় টানানো। বাঘ মানুষ ধরলে তার নিশানা হিসাবে কাপড় বাঁধা থাকে। বিপদের চিহ্ন রূপে কাপড় বেঁধে রাখা হয়। তাই দেখে লোকে হুঁশিয়ার হয়ে চলে।

অফিসে ফিরে বাঘের সন্ধান মিললো। কাছাকাছি জঙ্গলে ঘের পড়েছিল। তার এক জায়গায় কাঠ জড়ো করে রাখছিল কয়েকজন। কিন্তু সে কাঠ আনার উপায় ছিল না। লোক উঠলেই বাঘিনী তাড়া করে।

আমরা ওদের তিন-চার জনের কাছ থেকে সব বৃত্তান্ত শুনলাম। শেষে ঠিক করলাম পরের দিন ভোরে লঞ্চে লোটা কম্বল নিয়ে রওয়ানা হবো বাঘিনীর খোঁজে। কাঠুরিয়া দুজনকে আমরা সঙ্গে নিলাম। আর নেয়া হলো একটা ছাগল। ছাগলটাকে জায়গা

মতো বেঁধে ফটোগ্রাফার, গার্ড ও অন্য সবাই আশপাশের গাছে বসে থাকবে। স্থান মনোনয়নের জন্য জব্বার, হামিদ সাহেব ও দুজন কাঠুরিয়া ছাগলটাকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকলো। বাঘের আনাগোনা ও তাজা পায়ের দাগ দেখা গেলো। সুবিধা মতো খাসীটাকে বেঁধে হামীদ সাহেব ও জব্বার গাছে উঠলো। হামীদ সাহেব গাছে চড়তে গিয়ে পা পিছলে তলায় পড়ে গিয়েছিলেন। ভাগ্যের জোরে শূল ফোটেনি বা অন্যকোনো বিপদ ঘটেনি।

কাঠুরিয়া দু'জন আসছিল আমাদের নিয়ে যেতে। বাবু ও আরশাদ তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে তৈরি হচ্ছিল। আর আমরা কয়েকজন ফালতু সব তদারক করছিলাম। বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল সেই সময়। যে দু'জন আমাদের নিতে আসছিল বাঘ তাদের পিছু নিল। হামীদ সাহেব ও জব্বার দু'জনেই গাছের ওপর থেকে বাঘের চলাফেরা দেখছিলেন। তাদের ভয় হলো কাঠুরিয়াদের সম্পর্কে। ওরা বাঘের আঁচ পায়নি। সুতরাং ওদের পিছনে যে মহারাণী ধাওয়া করেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিল জব্বাররা। সে চাইছিল বাঘটাকে গুলি করতে। কিন্তু হামীদ সাহেব বাদ সাধলেন। অগত্যা সে চিৎকার করে ভয়ের কথা শুনিয়ে দিতে থাকলো। মানুষের গলার আওয়াজ শুনে বাঘ লাফ দিয়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেলো।

কাঠুরিয়ারা বাঘের আঁচ পায়নি। ওরা আরো একটা ছাগল ও আমাদেরকে নিতে এসেছিল। বাবু, আরশাদ ও আর একজন যন্ত্রপাতি গুছিয়ে বনের ভিতরে ঢুকলো। অন্য কাঠুরিয়া গ্রামে গেল ছাগল আনতে। তার আসতে দেরি হয়নি। এরপর ছয়-সাত ঘণ্টা সবাই গাছেই বসে রইলো। কিন্তু বাঘিনীকে ক্যামেরায় ধরা গেল না। সে ঝোপে-ঝাড়ে কেবল ঘুরেছে, ফাঁকায় আসেনি। সুতরাং বাঘের ফটো নেয়া সে যাত্রা সম্ভব হলো না।

বিবিসির ফটোগ্রাফারও এসেছিলেন বাঘের ফটো নিতে।

তিনি অল্পের জন্যে এই বাঘিনীর কবল থেকে রক্ষা পেলেন। বাঘিনী তার দিকে লাফ দিলে ফটোগ্রাফার খালে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচান।

পরের বছর আবার বাঘের খোঁজে ঢাইনমারী এসে খবর পেলাম সেই বাঘিনী মারা গেছে। হিংস্রতা ও নরমাংসের লোভে তার প্রাণ গেছে। জঙ্গলে দু'ভাই গাছ কাটছিল। তাদের একজনের ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্য ভাই সাথে সাথে কুড়ালের কোপ ঝেড়ে দেয় বাঘিনীর ঘাড়ে। সেই কোপে বাঘ নেতিয়ে পড়ে ও তার ঘাড় কেটে প্রায় দু'ভাগ হয়ে পড়ে। কিন্তু যার ওপর বাঘ হামলা করেছিল তার ঘাড়-পিঠ বাঘের থাবা ও দাঁতের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে যায়। প্রায় সাত-আট মাস চিকিৎসার ফলে সে বেঁচে যায়। লোকটা আবার জঙ্গলের কাজে লেগেছে দেখে বিস্মিত হলাম।

ঢাইনমারীতে দু-তিন দিন কাটিয়েও বাঘের দিশা মিললো না। তিন-চার দিন আগে কাছাকাছি একটা কম্পার্টমেন্টে এক জেলেকে বাঘে ধরেছিল। সে কাঠ নিতে ডাঙ্গায় উঠলেই যমদূতের কবলে পড়ে। লোকটা প্রাণে বাঁচেনি। তার লাশ খুলনায় পাঠিয়ে দেয়ার খবর জানালেন স্টেশন অফিসার।

শেষ পর্যন্ত আমরা কচিখালি অভিমুখে রওনা হলাম। সেবার আমাদের সাথে ছিলেন আর একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট কনজারভেটর। ভদ্রলোকের নাম আমি ভুলে গেছি। তিনি যে লঞ্চ যোগাড় করলেন সেটা নিয়ে জঙ্গলে দ্রুত চলাচল করা চলে না। অবস্থা বুঝে ট্রাংকল করে চীপ কনজারভেটর সাহেবের হুকুম নিয়ে রেঞ্জের একটা লঞ্চ আনানো হলো।

কচিখালিতে পৌঁছে আমরা বাঘের আনাগোনার খবর পেলাম। স্টেশনের লোকজন, জেলে, বাওয়ালী সবাই বাঘের কথা আমাদের শুনালো। দিন দু'য়েক কাটলো বাঘের আনাগোনা ও চলাচলের পথ,

শিকার ধরে খাওয়ার ও বিশ্রামের জায়গা, প্রভৃতি দেখতে শুনতে। তৃতীয় দিনে সব ঠিকঠাক করা হলো কে কোথায় বসবে ও দু'টো ক্যামেরার কোনটা কোথায় রাখা হবে। বাবু, জব্বার ও হাশিমকে নিয়ে খড় বনের ঝোপের আড়ালে থাকবে। বাবু ক্যামেরা এক্সপার্ট হিসেবে ম্যাশিনম্যানের কাজ করবে। আর জব্বার ও হাশিম অগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পাহারা দেবে। অন্য ক্যামেরা নিয়ে শহিদুল হক, বয়াতি ও আমরা কয়েক জন ঘরের বারান্দায় বসবো।

সব যোগাড় করতে প্রায় আড়াইটা বাজলো। আমরা খেতে বসবো এমন সময় প্রবল গর্জন ভেসে আসতে লাগলো। বাঘের গর্জন পরিষ্কার কানে বাজতে লাগলো। হাশিম ছুটে এসে বললো, ঐ রকম ডাক এদিক থেকে দিলেও সাড়া দিতে দিতে ছুটে আসবে।

হাশিম বাঘের ডাক ডাকতে জানে। অতএব একটা মাটির হাঁড়ি নিয়ে ঝোপের কাছে গিয়ে ডাকের জবাব দিতে লাগলো। ওদিক থেকে বাঘের ডাক আর এদিক থেকে হাশিমের নকল ডাক। অদ্ভুত শিহরণ। বাঘ এদিক থেকে সাড়া পেয়ে সঙ্গিনীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু, তার ছুটাছুটি জঙ্গলের আড়ালে। একবার উত্তর দিক, একবার দক্ষিণ দিকে ছুটে গর্জন করছিল। হাশিমও সাড়া দিচ্ছিলো ঝোপের ভিতর থেকে। এই ডাকাডাকিতে সবাই তটস্থ। আমরা পুলকিত চিত্তে অপেক্ষা করছি-লাম যা কখনো দেখিনি, তাই দেখার জন্য। আধ ঘণ্টারও বেশি বাঘের গর্জন চলাচলের মধ্যে অকস্মাৎ লঞ্চের ভোঁ শব্দে সব থেমে গেলো।

নূর মোহাম্মদ সরকার আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। বগী স্টেশন থেকে খবর পেলেন আমরা কচিখালির দিকে গেছি। সুতরাং তিনিও সেই পথ ধরে এগুলেন। হরিণ ঘাটার মোহনায় এসে লঞ্চ

ভোঁ ভোঁ আওয়াজ ছাড়তে লাগলো। সেই আওয়াজে সব ঠাণ্ডা। বাঘের ছবি নেয়া আর সম্ভব হলো না। সরকার সাহেব পরে এসে আফসোস করতে লাগলেন। আমাদেরতো আফসোসের সীমা ছিল না।

পরের দিন সরকার সাহেবের লঞ্চে উঠে আমি ও শহিদুল হক কচিখালি ছাড়লাম। দুলার চরে হাঙ্গরের ছবি, পূজাপার্বণের দৃশ্য ক্যামেরায় তুলে নিয়েছিলাম। আর নিয়েছিলাম শিবসার কালী-মন্দিরের ছবি। ফিল্মে বাঘের ছবি বাবুরা ম্যানেজ করেছিল। ফলে বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী নামক তথ্যচিত্রটি সম্পূর্ণ হতে পেরেছে। এজন্যে কৃতিত্ব সকলের হলেও বাবুই সকলের আগে স্থান পাওয়ার অধিকারী।

মোহাম্মদ তোহা খান

বাঘের সন্ধানে সুন্দরবনে

